ধারাবাহিক রচনা

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের ইতিবৃত্ত

স্বামী চেতনানন্দ

(জুলাই-আগস্ট ২০২২ সংখ্যার পর)

শ্রীম ১৮৮৫ সালের জন্মোৎসবের সুন্দর বর্ণনা করেছেন। দিনশেষে ভক্তরা বিদায় নিচ্ছেন। ঠাকুর ভবনাথকে বললেন, ''তুই এত দেরিতে দেরিতে আসিস কেন?'' ভবনাথ (সহাস্যে)—''আজ্ঞে, পনের দিন অন্তর দেখা করি। সেদিন আপনি নিজে রাস্তায় দেখা দিলেন, তাই আর আসি নাই।'' ঠাকুর—''সে কিরে? শুধু দর্শনে কি হয়? স্পর্শন, আলাপ—এসবও চাই।''[২৫]

ওই পুণ্যদিনে ঠাকুরের এই ছোট উক্তিটি অধ্যাত্মপথের পথিকদের একটা অপূর্ব দিগ্‌দর্শন।

খুব সম্ভব এই জন্মদিনে এক দরিদ্র মহিলা নহবতে ঠাকুরকে রসগোল্লা খাওয়ান। এর বিবরণ রাম দত্ত, অক্ষয় সেন ও নিস্তারিণী ঘোষ বর্ণনা করেছেন। আমরা নিস্তারিণীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনাটি উদ্ধৃত করলাম :

''এক রবিবার আমরা সবাই দক্ষিণেশ্বরে ছিলাম। একটি গরিব স্ত্রীলোক ঠাকুরের জন্য চারটি রসগোল্লা নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তাঁর ঘরে এত ভক্ত বসেছিলেন যে সে ঘরে ঢুকে তাঁকে সেগুলো দিতে সাহস করছিল না। সে নহবতের বারান্দায় এসে করুণভাবে কাঁদতে লাগল, এই বলে যে এতদূর থেকে এসে ঠাকুরকে না দেখে তাকে ফিরে যেতে হবে। আমরা জানতাম যে ঐ চারটি রসগোল্লা আনাও তার পক্ষে এক মহান আত্মত্যাগ। যখন সে এই ভাবে কাঁদছিল, হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গার সম্মুখস্থ গোল বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। তিনি কয়েক মিনিট গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে তাড়াতাড়ি নহবতের দিকে গেলেন। বারান্দায় উপস্থিত হয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন, যেন কাকে খুঁজছেন। তারপর গরিব স্ত্রীলোকটিকে দেখে তার কাছে গিয়ে বললেন, 'আমার খুব খিদে পেয়েছে। আমাকে কিছু খেতে দিতে পার?' স্ত্রীলোকটি পরম আনন্দে রসগোল্লাগুলো তাঁকে দিল। তিনি চারটি রসগোল্লাই তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন এবং খেয়ে তাঁর ঘরে ফিরে গেলেন। স্ত্রীলোকটি আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে বাড়ি ফিরল।''[২৬]

১৮৮৫ সালে ঠাকুরের পঞ্চম জন্মোৎসব কালে তিনি তাঁর নিজস্বরূপ প্রকটিত করে ভক্তদের বলেছিলেন, ''যে রাম যে কৃষ্ণ—সেই এবার (নিজেকে দেখাইয়া) রামকৃষ্ণ হয়েছেন।'' ঠাকুর একাধিকবার শিষ্যদের একথা বলেছেন এবং শেষবার বলেন স্বামীজীকে কাশীপুরে দেহত্যাগের দু-তিনদিন পূর্বে। লাটু মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে শেষ

জন্মোৎসবের স্মৃতিচারণ করেছেন :

''দক্ষিণেশ্বরে শেষ যে-বার তাঁর জন্মোৎসব হোলো সেবার নরোত্তম কীর্ত্তনীয়া এসেছিলেন। সেবারে লোকের ভীড় হয়েছিলো—২৫০।৩০০ লোক খেয়েছিলো। সেবারে লোরেন বাবুকে ছুঁয়ে উনার সমাধি হোয়ে গেলো। সেইবার থেকে দুটো দল হোলো জানো—একদলে রইলেন রাম বাবু, গিরিশ বাবু, মনমোহন বাবু, কেদার বাবু আরো সব—তানারা ওনাকে 'অবতার' বলতে লাগলেন। আর একদলে রইলেন বলরাম বাবু, কিশোরী বাবু, সুরেশ বাবু, প্রাণকৃষ্ণ বাবু প্রভৃতি। সেবার উনি সকলকে জানালেন, 'যিনি ঈশ্বর তিনিই ত মায়া হয়েছেন, তিনিই ত জীবজগৎ হয়েছেন। অবতারেতে তাঁর একরকম প্রকাশ, আর জীবেতে তাঁর আর একরকম প্রকাশ। তিনি এক, তিনিই সব।... যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই এবার (নিজেকে দেখাইয়া) রামকৃষ্ণ হয়েছেন।''[২৭]

জন্মোৎসব : ষষ্ঠ বর্ষ—১৮৮৬

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় শেষ জন্মোৎসব (রবিবার, ৭ মার্চ ১৮৮৬) পালিত হয় কাশীপুর বাগানবাড়িতে। শ্রীম কথামৃতে লিখেছেন : ''ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে বাগানে পূজা হইল। নামমাত্র উৎসব হইল। গত বর্ষে জন্মমহোৎসব দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে খুব ঘটা করিয়া হইয়াছিল। এবার তিনি অসুস্থ। ভক্তেরা বিষাদসাগরে ডুবিয়া আছেন।''[২৮] লাটু মহারাজ বলেন : ''কাশীপুরে ঠাকুরের জন্মোৎসব খুব সংক্ষেপে সারা হয়েছিল। সেদিন লোরেন ভায়ের গান হোলো, আর সুরেন্দর বাবু একছড়া ভালো গোড়েমালা ঠাকুরের গলায় পরিয়ে দিলেন। বলরাম বাবু ও মাষ্টারমশায় একখানা কাপড় ও আংগা দিলেন, আর এক জোড়া চটিজুতো কে এনেছিলো জানি না। সেটা আবার চুরি হয়ে যায়।''[২৯]

তিরোভাবের পর জন্মোৎসব—১৮৮৭-১৮৯১

১৮৮৭ থেকে ১৮৯২ বরানগরে এবং ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৭ আলমবাজার মঠে ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যেরা তাঁর জন্মতিথি পালন করেন এবং গৃহী শিষ্যেরা ত্যাগী শিষ্যদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে জন্মোৎসব পালন করতেন। ত্যাগী শিষ্যেরা তখন কেউ পরিব্রাজক হয়ে বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে সাধন ভজন করতেন এবং বাকিরা বরানগর ও আলমবাজার মঠে ধ্যানধারণা ও স্বাধ্যায়ে রত ছিলেন। ১৮৮৭ সালে সাধারণ উৎসব পালিত হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি; ১৮৮৮ সালে তিথিপূজা ১৩ ফ্রেব্রুয়ারি সাধারণ উৎসব ১৯ ফেব্রুয়ারি; ১৮৮৯ তিথিপূজা ও উৎসব হয় ৩ মার্চ।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতিচারণ করেছেন :

''১৮৮৬ সালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষ করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে একটী করিয়া উৎসব হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপস্থিতকালে এইটী প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল। তখন অতি সামান্যভাবে হইত, জনকয়েক মাত্র ভক্ত উপস্থিত হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। যাহা হউক, তাঁহার তিরোভাবের পর ইহা বাৎসরিক উৎসব-রূপে পরিগণিত হইল। বরাহনগর মঠে নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা হইত... এবং তিথি-পূজা সামান্যভাবে হইত। তখন বাৎসরিক উৎসবটা মঠের হাতে ছিল না; মনোমোহন মিত্র, হরমোহন মিত্র, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, বৈকুণ্ঠ সান্যাল, হরমোহন চক্রবর্তী ও অপর সকলে থাকিয়া বলরামবাবুর বাড়ীতে সমস্ত ফর্দ করিতেন এবং হরমোহন মিত্র চাঁদা সংগ্রহের জন্য বহির্গত হইয়া যথাসম্ভব চাঁদা আনিতেন। প্রথম কয়েক বৎসর উৎসবে একশত হইতে পাঁচশত পর্যন্ত লোক হইয়া ছিল। এখনকার হিসাবে উহা অতি সামান্য

বলিয়া পরিগণিত হইবে, কিন্তু তখনকার দিনে ঐ ভক্তমণ্ডলী সমাবেশ অতি আনন্দপ্রদ ছিল।

''শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শয্যা ও ঘরটী নানাপ্রকার পুষ্প ও পত্রাদি দিয়া পরিশোভিত হইত; উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ধর্মদাস সুরই ইহার বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং তাঁহাদের সাথে আরও অনেকেই থাকিতেন। বড় কুঠির পশ্চিমদিকের আমতলার নীচে বাণ কাটিয়া ভোগ রান্না হইত। মুগের ডালের ভুনিখিচুড়ি, আলুকপির দম, দই, বোঁদে ও একটা চাটনি এইটাই সাধারণতঃ হইত এবং বেসম্ দিয়া বেগুন ভাজাও কয়েকবার হইয়াছিল। প্রাতে আগন্তুক ব্যক্তিদিগকে লুচি ও হালুয়া অল্প পরিমাণে দেওয়া হইত। অনেকেই নানাপ্রকার ফলমূলাদি ও মিষ্টান্ন লইয়া যাইতেন, তাহাও লোকে কিছু কিছু পাইতেন।... বৈদ্যনাথ পরামাণিক, কিশোরীমোহন রায়... ও বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল মহাশয় রন্ধনশালার তত্ত্বাবধান করিতেন; অপর সকলেও আবশ্যকমতো কার্য করিতেন।

''কুঠিবাড়ীর বড় ঘরটীতে বৈঠকী গান হইত। নারায়ণ চন্দ্র (নারায়ণ দাদা) নামক জনৈক দীর্ঘাকৃতি গৈরিকবসনধারী ব্যক্তি কয়েক বৎসর গান করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে পাখোয়াজ সঙ্গত হইত। সুবিখ্যাত পাখোয়াজ-বাজিয়ে গোপাল মল্লিকও উপস্থিত থাকিতেন। তখন এত কীর্তন হয় নাই, ধ্রুপদ গানটা অধিক হইত। নরেন্দ্রনাথও এক বৎসর অনবরত ধ্রুপদ গান গাহিয়াছিলেন।

''ভোগ নিবেদন হইলে সকলে বড় কুঠির বারাণ্ডায় ও ভিতরকার ঘরটিতে প্রসাদ পাইতে বসিতেন; লোক অল্প হইত এবং ঐ স্থানেই সঙ্কুলান হইত। শালপাতা পাতিয়া সারিবন্দী হইয়া লোক প্রসাদ পাইতে বসিতেন ও মহানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। অনেকে আবার তিন-চারিখানি শালপাতা পাশা পাশি করিয়া একটী বড় ঠাঁই করিতেন। প্রসাদ তাহাতে ঢালিয়া দেওয়া হইত এবং সকলে তাহার চারিদিকে গোল হইয়া বসিয়া একত্রে আহার করিতেন। যাহাদের ভোজন শেষ হইত, তাহারা উঠিয়া যাইত এবং তৎপরে লোক আবার তথায় আসিয়া বসিত।

''এইরূপ একপাত্রে বহুলোক প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। ইহাতে সকলেই বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। প্রসাদ উচ্ছিষ্ট হয় না, ভক্তের ভিতর জাতিবিচার নাই, সব একজাত এই ভাবটী তখন বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত। সকলেই প্রাতে যাইতেন, গঙ্গায় স্নান করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহে প্রণাম করিয়া পঞ্চবটীর তলায় বসিয়া ভগবানের চিন্তা করিতেন এবং নানারূপ সৎকথায় এবং সৎ-চিন্তায় দিনটী অতিবাহিত হইত। সকলেই পরিচিত লোক, সকলেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত এইজন্যই ঘনিষ্ঠ ভাবটী অতি দৃঢ় ও মধুর বোধ হইত। পরে ক্রমে ক্রমে উৎসবের ব্যাপার বৃদ্ধি হইতে লাগিল।''[৩০]

বরানগর মঠে ''প্রতিবছর ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়াতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হত অষ্টপ্রহরব্যাপী পূজার মাধ্যমে। দিনের বেলা হত দশাবতারের পূজা, রাত্রে মহাবিদ্যার পূজা। পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে হোম করে জন্মোৎসবের সমাপ্তি ঘটত। পরবর্তী রবিবারে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির বাগানে অনুষ্ঠিত হত সাধারণ-উৎসব। বছরের পর বছর লোকসংখ্যা বাড়তে থাকে। সাধারণ উৎসব সংগঠনের জন্য খুবই পরিশ্রম করতেন হরমোহন মিত্র। মঠ প্রতিষ্ঠার দু-তিন বছর পরের ঘটনা। একবার বরানগর মঠে (খুব সম্ভব ১৮৮৮ বা ১৮৮৯ সালে) শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা করেছিলেন শশীর পরিবর্তে নরেন্দ্রনাথই। লাটু মহারাজের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায় : 'একবার লোরেন ভাই ঠাকুরের তিথিপূজা করতে বসে চার-পাঁচ ঘণ্টা লাগিয়ে দিলো। শশী-ভাই ত পূজা দেখে অবাক হয়ো গেলো। শুনেছি, লোরেন ভাই ধ্যানে

বসে সেদিন মানসপূজা করেছিলো।' "[৩১]

মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন স্বামীজীর পূজা দেখবার মতো ছিল। তিনি একটানা তিন-চার ঘণ্টা ধ্যান করতেন। তখন তাঁর মুখ লাল হয়ে যেত। ধ্যানশেষে তিনি পুষ্পপাত্রের সব ফুল চন্দন মাখিয়ে ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করে ভাবে বিভোর হয়ে বেরিয়ে আসতেন।

জন্মোৎসব—১৮৯২-১৮৯৩

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে তাঁর ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যেরা গুরুর জীবন ও বাণী লোকমধ্যে প্রচার করতে লাগলেন। ১৮৯২ ও ১৮৯৩ সালের জন্মোৎসবের প্রসঙ্গে স্বামী প্রভানন্দ 'রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা' গ্রন্থে লিখেছেন :

''১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুরের জন্মতিথির কয়েকদিন আগে আলমবাজার মঠের আরম্ভ। তাঁর জন্মতিথি পড়েছিল সোমবার ২৯ ফেব্রুয়ারি। পরবর্তী রবিবারে দক্ষিণেশ্বর-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সাধারণ উৎসবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায় স্বামী শিবানন্দের একটি চিঠিতে। তিনি লিখেছেন : 'শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মোৎসব এবার মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছিল। কলিকাতাস্থ প্রায় ১৫০০ সুশিক্ষিত ভদ্রলোকসকল আসিয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্য হইতেই ৫/৬ সম্প্রদায় ভদ্রলোক হরিকীর্তন করিয়াছিলেন। এক সম্প্রদায় তাঁহার পবিত্র জীবনচরিত পাঠ করিয়া প্রায় সকল লোককেই মুগ্ধ করিয়াছিলেন। যে কুটিরে তিনি অবস্থিতি করিতেন এবং যে-স্থানে তিনি তপশ্চর্যা ইত্যাদি করিয়াছিলেন, বহুতর লোক সেই স্থানে যাইয়া অতি আনন্দে হরিকীর্তন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়াছিলেন। ইংরেজী শিক্ষিত লোক অধুনা বঙ্গদেশে যে এমন [ভক্তি-পরায়ণ] হইতেছেন, ''এ কেবল ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা।" ' পরিতৃপ্তির সুখস্মৃতি নিয়ে ভক্তগণ বাড়ি ফিরে যান।

''পরবর্তী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল রবিবার ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩। মহোৎসবের প্রেরিত অর্থের প্রাপ্তিসংবাদ দিয়ে স্বামী সারদানন্দ ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে লিখেছিলেন : 'মহোৎসব পরশ্ব হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৫/৭ হাজার লোক সমাগম হয়। সকলের মুখেই উৎসাহ, ভক্তি ও আনন্দের চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছিল।'

''এই দুটি মহোৎসবে যোগদানকারী ব্রহ্মচারী কালীকৃষ্ণের স্মৃতিকথা থেকে উৎসবের কিছু বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন : 'তখন ঠাকুরের জন্মোৎসব ভক্ত লইয়া সামান্যভাবেই হইত। খুব বেশি ভিড় হইত না। সেজন্য কুঠিবাড়ির পিছনে রান্নাবাড়ির দালানে ও চত্বরে ভোগ রান্না হইত ও কুঠিবাড়ির একটি ঘরে খিচুড়ি, তরকারি ও অম্বলের গামলাগুলি রাখা হইত ও অন্য ঘরে লুচি হালুয়া, দই, বোঁদের ভাঁড়ার হইত। অতিথি ও ভক্তেরা বারান্দাতেই বারে বারে বসিয়া প্রসাদ খাইত। ২/৩টি সঙ্কীর্তন দল আসিত। তাহারা ও ভক্তমণ্ডলী ঠাকুরের ঘরে সঙ্কীর্তনে খুব মাতামাতি করিত ও পরে পঞ্চবটী, বেলতলা ও মন্দির-প্রাঙ্গণে ভজন গান করিয়া বেড়াইত। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তেরা তাঁর ঘরের উত্তরদিকের বারান্দায় ঢালা শতরঞ্চি পাতা স্থানে বসিয়া ঠাকুরের বিষয় আলাপ-আলোচনা করিত। কেহ কেহ বা পঞ্চবটীতে বেলতলায় বসিয়া ধ্যান-ধারণা করিত। ৯/১০টার সময় সকলকে শালপাতার ঠোঙ্গায় একহাতা হালুয়া ও দুখানি লুচি প্রসাদ দেওয়া হইত ও মধ্যাহ্নে সকলে বসিয়া খিচুড়ি ভোগ পাইত।"[৩২]

জন্মোৎসব—১৮৯৪

১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের সাফল্যের সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে

পড়ল। এতকাল গৃহী ভক্তেরা ঠাকুরের জন্মোৎসবের নেতৃত্ব করেছেন। এখন ১৮৯৪ সাল থেকে সন্ন্যাসীরা এগিয়ে আসেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত উৎসাহের সঙ্গে খুব বড় করে জন্মোৎসব organize করলেন। 'হোর মিলার' কোম্পানির স্টিমার ভাড়া নেওয়া হল। এছাড়া পদব্রজে, ঘোড়ার গাড়িতে, নৌকায় বহু ভক্ত ও যাত্রী দক্ষিণেশ্বরে হাজির হল। এই দিন (১১ মার্চ ১৮৯৪, রবিবার) প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার লোক হয়েছিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ উৎসবে যোগদান করেন। নাটমন্দিরে কালীকীর্তন হয়।

রাম দত্ত ও কাঁকুড়গাছির ভক্তবৃন্দ দক্ষিণেশ্বরে আসেন। ঠাকুরের ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় বসে রাম গুরুর বিরহে অশ্রুবিসর্জন করেন। তাঁর মনের বেদনা ফুটে উঠেছে এই স্মৃতিকথায়—

''আজ সে দিন আর নাই। আজ সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। সেই ভক্তগণ আছেন, সেই দক্ষিণেশ্বর, কালীমন্দির ও পঞ্চবটী আছে, সেই আবির্ভাব মহোৎসবও প্রতি বৎসর হইতেছে, কিন্তু সে ভাব কোথায়? সে আনন্দ কোথায়? সে প্রেমের বন্যা কোথায়? সে সকল ফুরাইয়াছে, এ জীবনের মত ফুরাইয়াছে। আর সে দিন আসিবে না, আর তেমন করিয়া বস্ত্র পরিধান করাইয়া মনের সাধ মিটিবে না। আর সে সচন্দন চরণযুগল দেখিতে পাইব না, আর সে শ্রীমুখের মধুর নাম শ্রবণবিবরে ঢালিয়া মানব জন্ম সার্থক করিতে পাইব না! কালের স্রোতে সকলই চলিয়া গিয়াছে, কেবল স্মৃতিমাত্র এক্ষণে মৃতপ্রায় দেহকে জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।''[৩৩]

১৮৯৪ সালে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্মোৎসব বিরাট আকারে অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের নামকীর্তন করতে করতে ভাবাবেশে নৃত্য করেন। সমবেত ভক্ত ও দর্শকবৃন্দ তাঁর ভাবভক্তি দেখে মুগ্ধ হন।

প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ দত্ত ওই উৎসবক্ষেত্রের দুটি মজার অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন : ''মন্দিরের উঠানে বসিয়া সকলে প্রসাদ পাইলেন। নানা শ্রেণীর পুরুষ ও পল্লীস্থ স্ত্রীলোকেরাও একসঙ্গে প্রসাদ পাইলেন। এইবারই প্রথম দেখা গেল যে সকল বর্ণের লোক একসঙ্গে প্রসাদ পাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। দুইজন ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ প্রসাদ পাইতে ছিলেন; একজন প্রসাদ পাইবার পর অপরকে বলিলেন, 'এটা কেমন হলো হে? গঙ্গার ধার, কৈবর্তর বাড়ী, উনছত্রিশ জাত একসঙ্গে বসে অন্ন খেলাম—আমি ত কখন অপরের ছোঁয়া-লেপা অন্ন খাই নি, কিন্তু আজ ত এই ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া-লেপা অন্ন খেলাম। কি রকম হলো বল দিকিনি?' অপর ব্রাহ্মণটি বেশ ভক্তিমান লোক ছিলেন। তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা খেতে কি আপনার কোন দ্বিধা হইয়াছিল?' প্রথম ব্যক্তিটি বলিলেন, 'তা হলে খেলাম কেন?' দ্বিতীয় ব্যক্তিটি বলিলেন, 'কি জানেন এটা এ যুগের শ্রীক্ষেত্র—এ মহাপ্রসাদ—ইহাতে কোন জাতিভেদ নাই এবং উচ্ছিষ্টও হয় না।' প্রথম ব্যক্তিটি পরম আহ্লাদিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'ঠিক বলেছ, এই কথাটাই ঠিক! এখন আমার মনের সন্দেহ গেল।'

''জাহাজ যখন বহু সংখ্যক নিশান উড়াইয়া ভরাভর্তি লোক লইয়া ঘাটে আসিতে লাগিল তখন সকলেই উল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। প্রতিবাসী মুসলমান স্ত্রীলোকেরা ছোট ঘাটটিতে জল লইতে আসিয়া কলসি কাঁকে করিয়া জনসংখ্যা ও বহু নিশান-উড়ান জাহাজ দেখিতে লাগিল; তাহাদের মধ্যে একজন প্রবীণা অপর একজনকে বলিতে লাগিল, 'ওগো জান, সেই গদাই ঠাকুর! গঙ্গার পাড়ে বসে কাঁদতো। পাগ্‌লার ছেলেপুলে ছিল না তাই এখন জাহাজ ভরে সব ছেলেরা আসচে।' স্ত্রীলোকটি কথাগুলি এমন মিষ্টভাবে

বলিয়াছিল যে সেই শুনে সকলেই তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।”[৩৪]

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের উৎসব সংবাদ আমেরিকায় স্বামীজীর কাছে পৌঁছে যায়। তিনি খুশি হয়ে গুরুভাইদের চিঠির মারফত অনুপ্রেরণা দিতে থাকেন। ওই শতাধিক বর্ষ পূর্বেকার চিঠিগুলির ভাব ও ভাষা এখনও আমাদের মনে সাড়া জাগায়। স্বামীজী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন, ‘‘মহোৎসব বড়ই ধুমধামে হয়েছে, বেশ কথা, তাঁর নাম যতই ছড়ায় ততই ভাল।”[৩৫]

তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখে পাঠালেন : ‘‘এবারকার মহোৎসব এমনি করবে যে, আর কখনও তেমন হয় নাই। আমি একটা ‘পরমহংস মহাশয়ের জীবন চরিত’ লিখে পাঠাব। সেটা ছাপিয়ে ও তর্জমা করে বিক্রি করবে। বিতরণ করলে লোকে পড়ে না, কিছু দাম লইবে। হুজুকের শেষ!!!... এই তো কলির সন্ধ্যে।... দাদা, একবার গর্জে গর্জে মধুপানে লেগে যাও দিকি।” কলকাতার টাউন হল-এ স্বামী বিবেকানন্দের অত্যাশ্চর্য সাফল্যের স্বীকৃতিদানের জন্য বড় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর সংগঠনের জন্য স্বামী অভেদানন্দ বেশ পরিশ্রম করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে লিখলেন : ‘‘অদ্ভুত কর্মক্ষমতা তোমরা দেখাইয়াছ। ... ভায়া, ঐ তেজে একবার মহোৎসব কর দিকি। রৈ রৈ হয়ে যাক। ওয়া বাহাদুর! সাবাস্!”[৩৬]

২২ অক্টোবর ১৮৯৪ স্বামীজী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন : ‘‘এবারকার জন্মোৎসবে বোধ হয় আমি যোগদান করিতে পারিব। আমি পারি বা না পারি, এখন হইতে তার সূত্রপাত করিলে তবে মহা উৎসব হইতে পারিবে। অধিক লোক একত্র হইলে খিচুড়ি প্রভৃতি বসাইয়া খাওয়ানো বড়ই অসম্ভব ও খাওয়া দাওয়া করিতেই দিন যায়। এজন্য যদি অধিক লোক হয়, তাহা হইলে দাঁড়া-প্রসাদ, অর্থাৎ একটা সরাতে লুচি প্রভৃতি হাতে হাতে দিলেই যথেষ্ট হইবে। মহোৎসবাদিতে পেটের খাওয়া কম করিয়া মস্তিষ্কের খাওয়া কিছু দিতে চেষ্টা করিবে। যদি কুড়ি হাজার লোকে চারি আনা করিয়া দেয় তো পাঁচ হাজার টাকা উঠিয়া যায়। পরমহংসদেবের জীবন এবং তাঁহার শিক্ষা এবং অন্যান্য শাস্ত্র হইতে উপদেশ করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি।”[৩৭] *ক্রমশ*

তথ্যসূত্র

২৫। শ্রীম-কথিত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০১, অখণ্ড, পৃঃ ৭৩৬ [এরপর, *কথামৃত*]

২৬। সম্পাদনা : স্বামী চেতনানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪০৫, পৃঃ ৩২৩

২৭। চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, *শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬০, পৃঃ ১৬০ [এরপর, *লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা*]

২৮। *কথামৃত*, পৃঃ ১০২১

২৯। *লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা*, পৃঃ ২৫১

৩০। মহেন্দ্রনাথ দত্ত, *শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী*, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, কলকাতা, ১৩৭১, পৃঃ ১৩২-৩৫ [এরপর, *স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী*]

৩১। স্বামী প্রভানন্দ, *রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪০৮, পৃঃ ৫০ [এরপর, *আদিকথা*]

৩২। তদেব, পৃঃ ৯৪

৩৩। রামচন্দ্র দত্ত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত*, শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান, কলকাতা, ১৩৫৭, পৃঃ ১৫৭

৩৪। *স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী*, খণ্ড ২, পৃঃ ১২৭-২৮

৩৫। স্বামী বিবেকানন্দ, *পত্রাবলী*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০, পৃঃ ১৫৯ [এরপর, *পত্রাবলী*]

৩৬। *আদিকথা*, পৃঃ ৯৫

৩৭। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৭, ১৩৭১, পৃঃ ২২-২৩